**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের**

**জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ**

**আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব**

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছর দশ মাসের মধ্যে পুরানো ঢাকায় ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আওয়ামী লীগ বিগত ৭১ বছর ধরে রাজনীতির অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। আওয়ামী লীগের ইতিহাস সংগ্রাম, সৃষ্টি, অর্জন ও উন্নয়নের ইতিহাস। আওয়ামী লীগ ছিল পাকিস্তানে প্রথম কার্যকর কোনো বিরোধী দল। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের যাত্রাই শুরু হয় বাঙালিদের স্বার্থের সত্যিকার ও আপোষহীন প্রতিনিধি হিসেবে। তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রে কোনো বিরোধী দল গঠন কিছুতেই সহজসাধ্য ছিল না। শাসকগোষ্ঠীর রক্ত চক্ষু আর সকল বাধা-প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের শুধু প্রতিষ্ঠা লাভই সেদিন ঘটেনি, অতি দ্রুত এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কী করে এটি সম্ভব হলো? এর প্রতিষ্ঠার পটভূমিই- বা কী? আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করতে ও এর মূল লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান কী ছিল? এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে এ নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

পটভূমি

৪০-এর দশকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ ভাবে দ্বি-ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে, সোহ&রাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ বনাম ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ, যা খাজা গ্রুপ নামে পরিচিত ছিল। এ ছিল, একদিকে মধ্যবিত্ত অন্যদিকে অভিজাত-জমিদারি স্বার্থের দ্বন্দ্ব। অনেকে একে ‘জনগণ’ বনাম ‘প্রাসাদ’ দ্বন্দ্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার স্বত্ত্বাধিকারী মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন খাজা গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অবাঙালি নেতৃত্বের সমর্থন-সহানুভূতিও ছিল এদের প্রতি। সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের পেছনে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ও ছাত্র-তরুণদের নিয়ে গঠিত এক বিশাল কর্মী বাহিনী। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরাই ছিলেন বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের মূল শক্তি। সোহ্্রাওয়ার্দীর প্রত্যক্ষ সমর্থন নিয়ে ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর বাংলায় লীগকে সুদৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে তিনি নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে নিবেদিত করেন। তাঁর প্রগতিশীল নেতৃত্বের কারণে শতশত ছাত্র-যুবক দলের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। তাদের কাজ-কর্ম, থাকা-খাওয়া চালিয়ে নেয়ার জন্য ছিল ‘পার্টি হাউজ’। ঢাকার ১৫০ মুগলটুলী পার্টি হাউজ ছিল পূর্ব বাংলার তরুণ লীগ কর্মীদের প্রধান কেন্দ্র। ১৯৪৪ সালে আবুল হাশিমের নির্দেশে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। খাজা গ্রুপের হেডকোয়ার্টার্স ঢাকার ‘আহসান মঞ্জিল’-এর বিপরীতে ‘মুগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্প’ বা ‘পার্টি হাউজ’ গড়ে ওঠেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর সোহ&রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রথমে পাকিস্তানে না এসে ভারতে থেকে যান। এর মূলে ছিল মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিদ্বেষী আচরণ। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ৫ই আগস্ট কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে পূর্ব বাংলার জন্য মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোহ&রাওয়ার্দীর স্থলে লীগ হাইকমান্ডের প্রিয়ভাজন খাজা নাজিমুদ্দীন নতুন নেতা নির্বাচিত হয়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। এমনকি, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে সোহ্্রাওয়ার্দী পেশাগত কারণে একবার ঢাকা এলে, তাঁকে জোর করে স্টিমারে তুলে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তানের গণপরিষদ থেকে তাঁর সদস্যপদ পর্যন্ত বাতিল ঘোষণা করা হয়। যাহোক, এ সময় ১৫০ মুগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্প বা পার্টি হাউজ ছিল সোহ্্রাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থক ছাত্র ও তরুণ কর্মীদের মিলন কেন্দ্র। এখান থেকে তারা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা স্থির করেন। এভাবে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে (১৯৫৩ সালে সংগঠনের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দ বাদ দেয়া হয়)। উল্লেখ্য, দেশ বিভাগের পর সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৭) বঙ্গবন্ধু কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং প্রথমে ১৫০ মুগলটুলী পার্টি হাউসে ওঠেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সরকারি দল মুসলিম লীগকে কার্যত একটি ‘পকেট সংগঠন’ বানিয়ে রাখে। লীগের ত্যাগী, পরীক্ষিত নেতা-কর্মী, যাদের অধিকাংশ সোহ&রাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের দলে বা সরকারের কোথাও কোনো স্থান হলো না। উদ্ভূত অবস্থায় করণীয় স্থির করার লক্ষ্যে টাঙ্গাইল ও নারায়নগঞ্জে প্রগতিশীল মুসলীম লীগ কর্মীদের দুটি সভাও ডাকা হয়েছিল।

-২-

যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিরা সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিল, ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান তাদের সেই প্রত্যাশিত রাষ্ট্র ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে তাদের রাষ্ট্রভাবনা ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের পূর্বাঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশ ও তদ্সংলগ্ন এলাকা) একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সে লক্ষ্যে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ&রাওয়ার্দী বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের এককালীন কেন্দ্রীয় নেতা ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎ চন্দ্র বসু, প্রাদেশিক কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি দলের নেতা কিরণ শংকর রায়, কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জে এম সেন গুপ্ত প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের বাহিরে তৃতীয় ‘স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র-তরুণ নেতা হিসেবে এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থেকে কলকাতায় স্বাধীন বাংলার পক্ষে একাধিক ছাত্র-জনতার সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। শর্ত সাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকারের ‘স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠায় এক ধরনের সম্মতি থাকলেও, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অবাঙালি হাই কমান্ডের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে সে উদ্যোগ সফল হতে পারে নি। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1906-1947*, UPL 2003, pp. 257-322) ।

শুরু থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের ওপর নেমে আসে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য ও জাতি-নিপীড়ন। পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত করেছিলেন ‘ফাঁকির স্বাধীনতা’ বলে। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা দাঁড়ায়, বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, ‘এক শকুনির হাত থেকে আরেক শকুনির হাতে পড়া’র মতো। বাংলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই ভাষানীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী ঔপনিবেশিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। এদিকে রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-নির্যাতন চলছিলই। এমতাবস্থায়, বিভাগ-পুর্ব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সোহ্্রাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থকরা একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে থাকেন। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান সংগঠক হোসেন শহীদ সোহ&রাওয়ার্দী এ সময়ে ভারতে অবস্থান করলেও, ঢাকার মুগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মী-সংগঠকদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এদিকে, পাশাপাশি সময়ে আরোও দুটি ঘটনা বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছিল। এর একটি হলো, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানের কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং, অপরটি, একই মাসে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে ক্ষমতাশীল মুসলীম লীগের প্রার্থী জমিদার পরিবারের খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে ১৫০ নম্বর মুগলটুলী পার্টি হাউজের প্রগতিশীল লীগ কর্মীদের প্রধান সংগঠক শামসুল হকের (টাঙ্গাইলের শামসুল হক নামে খ্যাত) বিজয় অর্জন। শেষের ঘটনাটি মুসলীম লীগ সরকারবিরোধী লীগ নেতা-কর্মীদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করে।

রোজগার্ডেনের কর্মী সম্মেলন

পুরানো ঢাকায় যে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, তার জন্য ঢাকা শহরের কোথাও হল বা স্থান না পাওয়া যাওয়ায় কে.এম. দাস লেনের কে.এম. বশির ওরফে হুমায়ুন সাহেবের প্রাইভেট বাড়ি ‘রোজ গার্ডেন’-এ ২৩ ও ২৪শে জুন ১৯৪৯ ঐ কর্মী সম্মেলন আহবান করা হয়। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাবেক সভাপতি ও মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী মুসলীম লীগ সরকারবিরোধী ত্যাগী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পূর্বেই একাত্মতা ঘোষণা করেন। সম্মেলন যাতে সফল না হতে পারে সে জন্য সরকার ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অপচেষ্টার অন্ত ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসললিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ এবং সিটি মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ সাহেবে আলম ২১শে জুন ১৯৪৯ এক বিবৃতিতে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ‘ক্ষমতালোভী’, ‘পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টকারী’, ‘মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী’ ইত্যাদি অখ্যায়িত করে ঐ সম্মেলনে যোগদান বা কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা না রাখার জন্য পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ বিশেষ করে ঢাকাবাসীর উদ্দেশে যৌথ আহবান জানিয়ে বলেন-

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের দ্বারা আগামী ২৩ শে ও ২৪ শে জুন তারিখে ঢাকায় মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনের নামে যে সভা আহূত হইয়াছে তাহার সহিত মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত ইহা দলগত স্বার্থ ও ক্ষমতালাভের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টির দ্বারা মুসলমান সংহতি নষ্ট করিয়া পাকিস্তানের স্থায়ীত্ব এবং অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছে (আজাদ, ২২ শে জুন ১৯৪৯, পৃ ৬)।

-৩-

কর্মী সম্মেলনের পাঁচ দিন পূর্বে তড়িঘড়ি করে ১৮-২০শে জুন কার্জন হলে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সম্মেলন আহবান করা হয়। ঐ সম্মেলনেও সরকারবিরোধী লীগ কর্মী-সম্মেলন আহবানের নিন্দা ও মুসলমানদের তাতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

যাহোক, আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রোজ গার্ডেনের কর্মী সম্মেলনে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। অনেক রাজনৈতিক নেতাও যোগ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, খয়রাত হোসেন এমএলএ, বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ, আলী আহমেদ খান এমএলএ, আল্লামা রাগীব আহসান, হাবিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে ধনু মিয়া প্রমূখ উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনের প্রথম দিনেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে (জেলে বন্দি অবস্থায়) যুগ্ম-সম্পাদক ও ইয়ার মোহাম্মদ খানকে কোষাধ্যক্ষ করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয় (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ, মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬, বাংলা একাডেমি ২০১৬)। ‘আওয়াম’ শব্দের অর্থ জনগণ আর ‘লীগ’ মানে ঐক্য বা সম্মিলনী। অর্থাৎ সরকারি মুসলিম লীগের বিপরীতে জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা। দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সহ-সভাপতিগণ ছিলেন আতাউর রহমান খান, আব্দুস সালাম খান, আলী আহম্মদ খান, আলী আমজাদ খান ও সাখাওয়াত হোসেন।

নতুন এ দলের জন্য ৪০-সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। দলের নব নির্বাচিত কর্মকর্তা ছাড়াও বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, নারায়নগঞ্জের আব্দুল আউয়াল, আলমাস আলী, শামসুজ্জোহা প্রমুখ এর সদস্য ছিলেন। সরকারি হয়রানি-গ্রেপ্তারের ভয়ে কমিটির বেশকিছু সদস্য অচিরেই বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ করেন। এদের মধ্যে সাখাওয়াত হোসেন ও এ কে এম রফিকুল ইসলাম ছিলেন। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর আর্থিক অসুবিধা ও সরকারের এডভোকেট জেনারেলের চাকরিটি তাঁর প্রয়োজন এ কথা বলে তিনিও ওয়ার্কিং কমিটি থেকে অব্যাহতি নেন।

রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন, নতুন দলের প্রতিষ্ঠা ও এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নিজের সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে এভাবে বর্ণনা করেন:

...পুরানা লীগ কর্মীরা মিলে এক কর্মী সম্মেলন ডাকল ঢাকায়- ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন সে সভা আহবান করা হয়েছিল... আমরা জেলে বসেই সে খবর পাই... আমরা সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, আমার মত নেওয়ার জন্য। আমি খবর দিয়েছিলাম, “আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের... নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোনো কর্মপন্থাও নাই।” আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি ছাত্র প্রতিষ্ঠান করব, না রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন হলে তাতে যোগদান করব? আমি উত্তর পাঠিয়েছিলাম, ছাত্র রাজনীতি আমি আর করব না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে... সকলেই একমত হয়ে নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন; তার নাম দেওয়া হল, ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী [মুসলীম] লীগ।’ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, জনাব শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং আমাকে করা হল জয়েন্ট সেক্রেটারী। খবরের কাগজে দেখলাম, আমার নামের পাশে লেখা আছে, ‘নিরাপত্তা বন্দি’। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১২০-১২১)।

‘মুসলিম’ শব্দ যুক্ত করে নব প্রতিষ্ঠিত দলের নামকরণ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন:

আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনও আসে নাই। তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ ১২১)

উল্লেখ্য, আলোচ্য রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন সফল করতে পুরান ঢাকার দুই কৃতী সন্তান ও নিবেদিতপ্রাণ লীগ কর্মী শওকত আলী ওরফে শওকত মিয়া (১৫০ মুগলটুলী পার্টি হাউজের স্বত্বাধিকারী) ও ইয়ার মোহাম্মদ খান (কারকুন বাড়ি লেন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শুরুর দিকে শওকত আলীর বাড়িই ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস।

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে শামসুল হক ‘মূল দাবি’ নামে একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে বিবেচনার জন্য তা পেশ করেন। পরবর্তীতে কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন করে খসড়া ম্যানিফেস্টো আকারে তা গৃহীত হয়। এর প্রধান দিকসমূহ ছিল : পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত দুটি পৃথক আঞ্চলিক ইউনিট এবং এর জন্য পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব, সকল

-৪-

সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার সমান অধিকার, সভা-সমাবেশ-সংগঠনসহ পূর্ণ বাক-স্বাধীনতা, সার্বজনিন ভোটাধিকার, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার ও শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিপুল সংখ্যক যুবকদের কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, সারা দেশে দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গরীবদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, বৃদ্ধ, অনাথ, অক্ষম, দুস্থদের রক্ষনাবেক্ষণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সর্বক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার, মাতৃমঙ্গল, শিশু সদন ও শিশু-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মুসলিম দেশসমূহের পাশাপাশি প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, বিশ্ব শান্তি রক্ষা, পাট, চা, ব্যাংক, বীমা, যান-বাহন, বিদ্যুৎ, খনিজ সম্পদসহ প্রাথমিক শিল্প জাতীয়করণ, সমবায় ও যৌথ কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ, ইত্যাদি। এছাড়া আশু লক্ষ্য ও কর্মসূচী হিসাবে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন, মূল শিল্প জাতীয়করণ, প্রশাসন ও সমাজ থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ, প্রশাসনের ব্যয় হ্রাস, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্বের ন্যায্য বন্টন, ইত্যাদি তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যাহোক, কর্মী সম্মেলনের পর দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মধ্যে যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল (যা পূর্বে উল্লেখিত), এর মধ্যে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থক হিসেবে পরিচিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রগতিশীল অংশের নেতাকর্মীরা জেলায়-জেলায় এ সময়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে সংগঠিত হতে থাকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশজুড়ে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক রূপ লাভের ক্ষেত্রে এই বিশেষ অবস্থা খুবই অনুকূল হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন গণদাবি যেমন বিদ্যমান খাদ্য সংকট নিরসনের ব্যাপারে সভা-সমাবেশ, ভুখা মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের ওপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করায় নতুন এ দলের প্রতি দ্রুত জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর প্রতিষ্ঠা লাভ করায় আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার শুরুতে নামের সঙ্গে ‘মুসলিম’ শব্দ যুক্ত রাখতে হয়েছিল। তবে ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে (তখন তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক) দলের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দ বাদ দিয়ে সংগঠনের সদস্য পদ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তারিত কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাই ছিল বাঙালিদের দল হিসেবে। এর চেতনামূলে ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা। স্বল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলের নেতৃত্বের অগ্রভাগে চলে আসেন। ১৯৫২ সালে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫৩-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ১৩ বছর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে সভাপতি নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগকে তৃণমূল পর্যায় থেকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে বাঙালির জাতীয় মুক্তির মঞ্চে পরিণত করতে তিনি সর্বশক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি এ জন্য ১৯৫৭ সালে মন্ত্রিত্বের পদ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের পদে নিজেকে বহাল রেখেছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধোত্তর তাঁর বাঙালির মুক্তি সনদ ৬-দফা কর্মসূচি (১৯৬৬) (দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, ‘আমাদের বাঁচার দাবী’ ৬-দফা’র ৫০ বছর, বাংলা একাডেমি ২০১৬), তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা (১৯৬৮) মোকাবেলা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচনে ৬-দফা প্রশ্নে বাঙালিদের আওয়ামী লীগের পক্ষে গণরায় বা ম্যান্ডেট লাভ ও বিপুল বিজয় অর্জন, ‘নির্বাচনের রায় বাঞ্ছাল করতে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ২-২৫শে মার্চ ১৯৭১ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে বাঙালিদের প্রতি আহ্বান, ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত বঙ্গবন্ধুর সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ গঠিত মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। এরই সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত চেতনা এবং বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ লালিত নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন ঘটে। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখানেই।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’। দেশের ঐতিহ্যবাহী, বৃহত্তম ও জনগণের দল আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এটিই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

#

লেখক : উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

২১.০৬.২০২০ পিআইডি নিবন্ধ